কওমি মাদ্রাসায় গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রণের অবসান হোক

শোয়াইব আহমাদ, আবদুল্লাহ খালিদ, লাবীব হাসান, মুকিত উসমান, শাহনাজ খানম, মাহমুদা সুলতানা, তাসনীম আহমদ হাসান কোব্বাদী, রুবাইয়াত মিঞা, গাজী ফখরুল, আকবর মিয়াজী ও শাহীন হাসনাত

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা আইন পাস হলে দেশে লাখ লাখ লাশ পড়বে বলে আবারও হুঁশিয়ার করে দিলেন বাংলাদেশ কওমি শিক্ষা বোর্ডের (বেফাক) মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার। গত শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। এর আগে ২৭ অক্টোবর হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীও একই মন্তব্য করেন। ওইদিনই হেফাজতের আমির আল্লামা আহমদ শফী এ আইন পাস হলে দেশে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। ফলে পরের দিন আর ওই আইনটি মন্ত্রিসভায় ওঠেনি। তাদের এমন রণ হুঙ্কারে আপাতত সরকার পিছু হটলেও এমন বালকসুলভ মন্তব্যে রীতিমতো লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে দেশের চিন্তাশীল নবীন-প্রবীণ আলেমদের। তারা বলছেন, রাজনীতির নামে এমন স্বেচ্ছাচারিতা কাম্য নয়। তারা কারও এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য অন্যের শেখানো বুলি আওড়াচ্ছেন। তাদের এই দাবির সঙ্গে দেশের আলেম-ওলামা ও ছাত্র-শিক্ষকদের কোনো সমর্থন নেই। এমনকি তাদের এমন বক্তব্য ও হুঙ্কারকে পাগলামি বলেই মনে করছেন তারা। সে হিসেবে বলতে হয়, হেফাজত ও বেফাক নেতাদের এমন বক্তব্য নিয়ে; সম্ভব-অসম্ভব, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। যেমন 'লাখে লাখে সৈন্য চলে কাতারে কাতার/গনিয়া দেখিল মর্দ চল্লিশ হাজার।' এ জাতীয় পঙ্‌ক্তি পড়ার পর বুদ্ধিমান মানুষের মনে কোনো জিজ্ঞাসা জাগে না। অর্থাৎ সবাই ধরে নিয়ে থাকেন, পুঁথি-পুরাণের জগতে এ জাতীয় ঘটনা স্বাভাবিক। তদ্রূপ তাদেরও এমন অবিবেচনাপ্রসূত বক্তব্য শুনে বলতে হয়- এসব বাত কি বাত! কিন্তু সরকার যখন এমন বক্তব্যকে আমলে নেয়, তখন সেটা নিয়ে না ভেবে আর উপায় থাকে না।

শুনতে খারাপ হলেও বলতে কষ্ট হয়; একেকটি কওমি মাদ্রাসা যেন বিচ্ছিন্ন একটি রাষ্ট্র। একাধিক বেসরকারি কর্তৃপক্ষ নিজেদের মর্জিমাফিক পরিচালনা করছে এসব মাদ্রাসা। কোনো নীতিমালা নেই; দেশ ও সংবিধানের প্রতি কোনো তোয়াক্কা নেই। দেশের মূল ধারার শিক্ষার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। সেখানে পড়ানো হয় না নির্দিষ্ট কোনো পাঠক্রম। যে যার মতো পাঠক্রম সাজাচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো বিষয় কওমি মাদ্রাসার পাঠক্রমে না থাকায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীর মতো সমাজে বেড়ে উঠছে এখানকার শিক্ষার্থীরা। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সনদের নেই কোনো সরকারি স্বীকৃতি। ফলে কওমি মাদ্রাসায় লাখ লাখ শিক্ষার্থী মূল ধারার শিক্ষায় শিক্ষিতদের পাশাপাশি নানাবিধ নাগরিক সুবিধা নিতে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে না। এ অবস্থা চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। এই বিশালসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করার দাবি ছিল প্রাজ্ঞ আলেমদের। কিন্তু গুটিকয়েক কওমি মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠী বরাবরই এর বিরোধিতা করে আসছে রাজনৈতিক কারণে। কারণ এখানকার শিক্ষার্থীরা সমাজের মূলস্রোতে মিশে গেলে তাদের আর ভুল বুঝিয়ে রাজনীতির মাঠের জোয়াল টানানো যাবে না। হরতালে পিকেটারের অভাব হবে।

বর্তমান মহাজোট সরকার কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত চিন্তাশীল অরাজনৈতিক আলেমদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনের উদ্যোগ

নেয়। কিন্তু কওমি মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীর একাংশ ও হেফাজতে ইসলামসহ ধর্মভিত্তিক কিছু সংগঠনের আপত্তির মুখে আইনটি মন্ত্রিসভা থেকে প্রত্যাহার করে। দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই ইস্যুতে হেফাজতকে মাঠ গরম করার সুযোগ না দিতেই হয়তো সরকার এ কৌশল নিয়েছে। ফলে কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণকারী মহলবিশেষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ হয়তো এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু কওমি মাদ্রাসাগুলোর লাখ লাখ শিক্ষার্থীর উপকার কি হয়েছে? কে দেবে এর জবাব?

আসলে কওমিওয়ালাদের বিশেষ একটি গোষ্ঠী তাদের পালিত সম্প্রদায় ভাবার কারণে এমনটি হয়েছে। কওমি শিক্ষার কোনো সরকারি স্বীকৃতি না থাকলেও, শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি না পেলেও মাথাব্যথা নেই কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রকদের। কারণ তারা তো আছেন বেশ। নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা চলে যাওয়ার ভয়ে সরকারি স্বীকৃতি চান না তারা। তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে 'পরকাল নষ্ট' হওয়ার ভয়ে কেউ মুখ খোলার সাহসও পান না। অনেকেই কওমি মাদ্রাসার এসব নিয়ন্ত্রককে লালসালুর মজিদের সঙ্গেও তুলনা করতে কসুর করেন না। এরা ধর্মের মুখোশের আড়ালে সমাজের অসহায়-অবহেলিতদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে, পরকালের ভয় দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের ধান্ধায় লিপ্ত। এখানকার শিক্ষার্থীদের অসহায়ত্ব ও অসচেতনতাকে পুঁজি করে নিয়ন্ত্রকরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে দেদার। এখন প্রশ্ন হলো, এমন স্বেচ্ছাচারিতা কি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে? রাষ্ট্রের কি কোনো দায় নেই? কী জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী?

আমরা জানি, জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে দেশের সব নাগরিককে বৈষম্যহীনভাবে যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ করে দিতে রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। বেফাক ও হেফাজতিরা যতই বলুক- স্বীকৃতি চাই না, কিন্তু দেশের নাগরিক কওমি মাদ্রাসার লাখ লাখ শিক্ষার্থীর প্রতি সরকার তো দায় এড়াতে পারে না। আধুনিক বিশ্বের প্রতিযোগিতায় সক্ষম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ সব ধরনের জ্ঞানচর্চার সুযোগ করে দিতে হবে তাদের জন্য। সুতরাং হাল ছেড়ে দেওয়া নয়, বরং সময় নিয়ে আরও সুচিন্তিত ও দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েই এগোতে হবে সরকারকে। একটা বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হয়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থী বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী হয়ে থাকতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, কওমি মাদ্রাসায় হাত দিলে দেশে লাখ লাখ লাশ পড়বে বলে হেফাজত ও বেফাক নেতারা যে হুমকি দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ এখতিয়ারবহির্ভূত, উস্কানিমূলক, প্রচলিত আইনেও অপরাধ। সরকারের উচিত তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া। এ বিষয়েও আমরা সরকারের দৃষ্টি কামনা করছি। সেই সঙ্গে সরকারকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, বাংলাদেশের রাজনীতিতে হঠাৎ করে হেফাজতের উত্থান এবং শাপলা চত্বরের ঘটনা পেছে ততোধিক দ্রুতগতিতে মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলে সরকার মারাত্মক ভুল করবে। আর সেই ভুলের মাশুল যে শুধু বর্তমান সরকার বা কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে দিতে হবে তা নয়, এর প্রভাব পড়বে সারা জাতির ওপর। যার প্রথম দৃষ্টান্ত কওমি মাদ্রাসা আইন প্রত্যাহার। আমরা এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে চাই।

○ লেখকবৃন্দ : কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক ও কওমি সনদ আন্দোলনের কর্মী